রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলন

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক প্রদত্ত

রঙ্গপুর

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৪

সমবেত শ্রদ্ধেয় ভদ্রবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আমার যোগ্যতার কথা বিচার না করেই আমার উপর আপনারা যে সম্মান অর্পণ করেছেন, তার মূল্য সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। এজন্য প্রথমেই আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাহিত্য-সভায় সভাপতির আসন থেকে অভিভাষণরূপে কি কথা বলা যেতে পারে, ভাবছি। আপনারা জানেন, রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কারাদির জন্য সঙ্ঘ-সমিতির বৈঠক করা এবং সাহিত্য-সভার মধ্যে ভেতরের পার্থক্য অনেকখানি। পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলিতে সঙ্ঘগঠন, অধিবেশন ইত্যাদি অপরিহার্য। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রাথমিক প্রয়োজনাবলীর সঙ্গেই প্রথমত এই কর্মবিভাগগুলি সংশ্লিষ্ট—বহুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত না হয়ে এখানে প্রচেষ্টা সফল হয় না। অন্যদিকে, সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়, —তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। আপনারা জানেন, কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য-ভাবাবেগ তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, ইহার জন্য আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব, বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যাবিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মালমশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন, ভালোবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত সৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান; চারিপাশের মানবসমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তাঁর সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'-কে তলিয়ে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে, তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত-স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো সাহিত্য-সভা যখন আহ্বান করা হয়, তখন তার উদ্দেশ্য কোনো কবি-সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে সহায়তা করা নয়, কারণ তা হতেই পারে না। যেমন ধর্মের তেমনি সাহিত্যের সাধনা দল বেঁধে করার নয়। তা হলে এই জাতীয় বৈঠকে কী ফল লাভ হতে পারে ?প্রথমত, এখানে সাহিত্যিকরা, সাহিত্যরসিক ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য অনুরাগী জনসাধারণ সামাজিক মানুষ হিসেবে একসঙ্গে মেলবার সুযোগ পান। কারণ, এ কথা ভুললে চলবে না যে এমন কি শ্রেষ্ঠ কবি বা লেখকদেরও রসবিভোর আত্মস্থ শিল্পী-সত্তা, যার মধ্য দিয়েই শুধু তাঁরা আপনাকে নিবিড় পূর্ণভাবে অনুভব করেন, এ ব্যতীত অন্য একটি সামাজিক সত্তাও আছে। এই সব জায়গায়যখন তাঁরা যোগদান করতে আসেন, তখন প্রধানত তা সামাজিক মানুষ হিসেবেই করতে আসেন। দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে সাহিত্য-প্রচার, তাঁদের যথার্থ সৎসাহিত্যের সংস্কৃতিগত ও আনন্দগত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা—এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তৃতীয়ত, সাহিত্য, বিশেষ করে সমসাময়িক-সাহিত্য সম্বন্ধে এখানে সমবেত গুণীজন, সমালোচক ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মুখোমুখি বসে যে বৈঠকী আলাপ-আলোচনা হয়, তা একদিকে যেমনই চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তার তেমনই যথেষ্ট সমালোচনাগত মূল্য রয়েছে। এখানে সভাপতির অভিভাষণে এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তৃতা

দিতে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কীয় এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে ও হয়ে থাকে, যার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়তো অনেক সময়ে অনেকেরই মনে জাগে, কিন্তু অনুকূল আলোচনার ক্ষেত্র মেলে না। এই সব ছাড়া আরো অনেক দিক আছে, যার মূল্যে সাহিত্য-সভার মূল্য।

সাহিত্যের কী মূল্য ?ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড় রেশময় একটি'লিরিক্', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবন-নাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে, আমাদের জীবনে সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার ?উত্তর হচ্ছে, দরকার,—অত্যন্ত বেশি দরকার আরো এই জন্যে যে, এই সব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্‌ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি— দু-পাশের এই দুই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটা আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশস্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকীরিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে পায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পেছনে পড়ে থাকে,—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্তত খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্তত কোনো কোনো ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত,—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া, কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানত জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশনে, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি, —সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ-সত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন, তার মর্ম এই যে আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝান হল ! আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে 'রিয়্যালিটি' বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না; তাই তোকবিকে, রস-স্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাঁক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও,—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনেরই হয়ে উঠবে; রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম কোনো আদর্শের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানীর জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক

দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপ তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদগ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকারীভেদ মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানত 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে— বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধুম্রলোক নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথা-সাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণীপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়াপাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন পণ্ডিত, দু'একজন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকসেট কে পড়ে ?চসার, দান্তে, মিল্টন, এদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদের পাতা ওল্টায়না—সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বাল্‌জাক তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে সখ করে পড়ে ?স্কট, হেনরি, জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গাল-ভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাদে সেন্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি। পার্ক স্ট্রীটে ওয়েলডন লাইব্রেরি একটা খুব বড় বিলিতী ও আমেরিকান উপন্যাস আমদানীকারক লাইব্রেরি—অনেক সাহেবমেম, আমাদের দেশের লোক নভেল পড়বার জন্যে তার সভ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু তিন বছর অন্তর বইয়ের আলমারি থেকে সমস্ত পুরাতন বই নিষ্কাশিত করে দিতে হয়—সস্তায় সেগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানদারেরা নীলামে ডেকে নিয়ে যায়। লোকের হুজুগ নতুন বই চাই, এ মাসের যদি হয় তবে আর ও মাসের চাইবে না—প্রায় সেই অবস্থা। ভালো-মন্দের বিচার একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু খুব বেশি নেই।

ওপরের সব কথা স্বীকার করে নিলেও একটা কথা থেকে যায়। যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে বা রসসঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মতো জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, উর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মতো সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথা সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য-সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসেবে তার, মূল্য কিছুই থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাঁদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান। কথাশিল্পী যা নিজের চোখে

দেখছেন, তাই তাঁকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা সুষ্ঠু করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'এমা বোভারি'-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে !

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই ?জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মতো করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয়সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সমুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্যে দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দু একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগান্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোনো সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থাকে—করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোনো প্রচার-বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফলেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে 'স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ'—অনেক কিছুর মতো এ ক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি ও শ্লীলতা অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস-চেতনায় পাই। এই জন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখনো তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতেগিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই শুধু তা হয় আর্ট। তখন তা আর শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণবুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে, এবং, যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয় রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এইই নয়। তাছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি ?

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে আমাদের মতো পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা-সাহিত্যিকের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই খাড়া বড়ি থোড়"—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যতার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন,তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল-বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনেফুল-বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।

উপরে সাহিত্য সম্বন্ধে মাত্র দু-চার কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। বাংলা-সাহিত্যে বর্তমানে নব নব সৃজনী প্রতিভা বহু ভাবে আপনাকে বিকাশ করবার সাধনায় লিপ্ত। এখানে সমবেত বন্ধুগণ যদি সাধারণভাবে যাবতীয় সাহিত্যের ও বিশেষ করে বঙ্গসাহিত্যের মূল স্রোতোধারাটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখা নিজেদেরই জন্য কেন এত অত্যাবশ্যক—সেইটি মনে মনে স্থায়ীভাবে আলোচনা করেন, তবেই এই বৈঠক সফল হয়েছে বলা যাবে। পরিশেষে, যাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় এখানে ডেকে এনেছেন, তাঁদের আর এক বার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৪ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়